দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে আখ্যান ভাবনা ঃ সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন

উপন্যাসে আখ্যান ভাবনা আলোচনার পূর্বে উপন্যাস ভাবনা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্য আঙিনায় নবতম সংযোজন উপন্যাস। ছাপাখানার ক্রমবিকাশ, সাময়িক পত্রের প্রচলন, শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণির আবির্ভাব, গণতান্ত্রিক চেতনা ও ব্যবস্থার উদ্ভব ইত্যাদির পথ বেয়ে উপন্যাসের আবির্ভাব। প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও আখ্যায়িকা, পঞ্চতন্ত্র ও বৌদ্ধজাতকের গল্প, রূপকথা, চরিত সাহিত্য, ময়নসিংহ গীতিকা ইত্যাদিতে কখনও কখনও উপন্যাসের বীজ দেখা গেলেও, বাংলায় উপন্যাসের শুরু উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজি 'নভেল' এর হাত ধরে। এর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একক কৃতিত্ব দাবী করতেই পারেন। এর আগে যে সব রচনা আংশিক কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন তা হল, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ততকালীন বাবু সমাজকে কেন্দ্র করে লেখা 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩), প্যারীচাঁদ মিত্রের বখাটে উচ্ছৃঙ্খল ছেলের জীবন কাহিনি 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮), এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের নক্সা জাতীয় রচনা 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' (১৮৬২)। এগুলির মধ্যে উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত হিসাবে 'আলালের ঘরের দুলাল' কিছুটা হলেও বিশ্লেষকদের মন জয় করে নিয়েছে। কারণ এখানে কিছুটা হলেও বাস্তবতা ও চরিত্র নির্মাণ কৌশল চোখে পড়ে। তবে বাস্তব জীবন পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত রচনাকেই উপন্যাস বলে গণ্য করা যায় না। বাস্তব ঘটনাগুলির যৌক্তিক পারম্পর্যে আবদ্ধ করার সাথে সাথে জীবনের একটি সামগ্রিক সত্যকে তুলে ধরাও উপন্যাসের লক্ষ এবং ঔপন্যাসিকের কাজ বঙ্কিমচন্দ্র সেই লক্ষকে সামনে রেখে এই মহান কাজে ব্রতী হলেন কল্পনাশক্তি ও বাস্তবপর্যবেক্ষণ শক্তির মেলবন্ধনে তাঁর লেখনী দিয়ে নির্মিত হল একের পর এক যুগান্তকারী উপন্যাস যা

বাংলা সাহিত্যে আজও মাইলস্টোন।

আখ্যান নিয়ত পরিবর্তনশীল একটি ভাবনা। গতিশীলতা এর অন্যতম বৈশিষ্ট। সময়ের সাথে সাথে আখ্যান ভাবনারও পরিবর্তন হয়। সময়কে অস্বীকার করে যেমন সাহিত্য হতে পারে না ঠিক তেমনই আখ্যানের ক্ষেত্রেও সময়ের ছাপ সুষ্পষ্ট। সময়ের তালে তালে সমাজ, পরিবেশ, মানুষ, মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে সাহিত্যে সঠিক রূপায়নের ক্ষেত্রে আখ্যানেরও পরিবর্তন ঘটাতে হয়। আখ্যানের চরিত্র তাদের মুখের ভাষা, চাল-চলন, সামাজিক রীতি-নীতি, সমস্ত কিছু সময়োযোগী করে তুলতে হয়। আমরা আগেই জেনেছি সাহিত্য সমাজের দর্পণ, তার জন্য সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ের সঠিক উপস্থাপন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে যদিও সমলোচকেরা বলতেই পারেন, বিবেচিত হয়। না সাহিত্যে কল্পনার স্বাধীনতা আছে, তবে তাঁর সীমাবদ্ধতাও আছে। শুধুমাত্র বাস্তব ঘটনার বর্ণনা যেমন সাহিত্য তেমনই শুধু কল্পনা দিয়েও সাহিত্য হয় না কারণ তার কোন ভিত্তি থাকে না তাই বাস্তব ও কল্পনার সঠিক মিশ্রনই আখ্যানের স্থায়িত্ব নির্মাণ করে। যা ঘটে গেছে বা যা ঘটছে তা যেমন সাহিত্যের বিষয়, তেমনই যা ঘটা সম্ভব তাও সাহিত্য বিষয় পদবাচ্য। সম্ভবনার কথা মাথায় রেখে নির্মাণকারীকে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হতে হয়। যে লেখক যত বেশি দূরদৃষ্টি সম্পন্ন তাঁর রচনা তত বেশি কালজয়ী।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে এক নতূন সাহিত্য শৈলি রূপে আত্মপ্রকাশ করে, যা উপন্যাস নামে পরিচিত হয়। পাশ্চাত্য নভেল এর অনুকরণে এই শিল্প রূপের আবির্ভাব বলে সমলোচকদের মত। উপন্যাস নামে না থাকলেও বিষয়ের দিক থেকে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস ভাব যে ছিল তা আমরা আমাদের আখ্যান কাব্য গুলি বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারি উল্লেখ্য মুকুন্দ চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল', যাকে আধুনিক বিশ্লেষকরাও উপন্যাস লক্ষণ যুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বিভিন্ন মনসামঙ্গল ও অন্যান্য রচনা। তবে উপন্যাসের স্বরূপ নিয়ে তাত্ত্বিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। এক এক যুগে এক এক রকম কাঠামো তৈরি হয়েছে ঠিক পরের যুগে তা লঙ্ঘিত হয়েছে কাঠামোর এই গতিশীলতা আজও উপন্যাস শিল্পকে স্বমহিমায় বাঁচিয়ে রেখেছে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস শিল্পের প্রথম লগ্নে যে যে লক্ষণ

দেখে উপন্যাস বলে নির্ধারণ করা হত একালেও তার ব্যতিক্রম নেই। তবে বর্তমানে তার সাথে আরও অনেক লক্ষণ সংযুক্ত হয়েছে এর ফলে উপন্যাসের গণ্ডিও ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে।

উপন্যাসের মূল উপকরণ হল জীবন। সেটা মানব জীবন হতে পারে, সমাজ জীবন হতে পারে। অর্থনৈতিক জীবন ইত্যাদি হতে পারে সবকিছু নিয়েই জীবন, আর উপন্যাস হল সেই আখ্যান যেখানে মানব জীবনের সুস্পষ্ট শিল্পিত অখণ্ড বিন্যাস। যদিও মানব জীবনের কাহিনি তবুও আমরা বলতেই পারি উপন্যাসের মানুষ ও বাস্তবের মাহায়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। বাস্তবের মানুষের মধ্যে আমরা সাধারণত একটি দিকই দেখতে পাই তার মনের অবস্থান জানার কোনো উপায় আমাদের জানা নেই, কিন্তু ঔপন্যাসিক বা শিল্পী তাঁর পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে মানুষের বাইরের পরিচয়, এবং কল্পনা শক্তির সাহায্যে মানুষের মনের পরিচয় অখণ্ড রূপে আমাদের সামনে তুলে ধরেন। ঔপন্যাসিকের প্রধান কাজই হল মনের কথাকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা। লেখক একটা ভাবনা কে সামনে রেখে উপন্যাস রচনায় হাত দেন। ভাবনার যেহেতু নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই তাই তার রূপ দানে কিছু উপাদানের প্রয়োজন হয়। সেগুলি হল কাহিনি বা গল্প (প্লট), চরিত্র, সময়, ভাষা ইত্যাদি।

উপন্যাস আলোচনার প্রথম দিকে কাহিনি এবং প্লট এবং এর মধ্যে তেমন কিছু পার্থক্য করা হত না। এই ধারণা পরবর্তী কালে সাহিত্য আলোচনায় এসেছে। ফরস্টারই প্রথম দেখান গল্প এবং প্লট এর মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। গল্প বলতে বুঝিয়েছেন কতকগুলি ঘটনাকে সময় অনুযায়ী সাজিয়ে দেওয়া। অন্য দিকে প্লট হল কার্যকারণ সম্পর্কযুক্ত কাহিনি। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলতে পারি,

গল্প ঃ প্রেমিক মরলো প্রেমিকাও মরলো

প্লটঃ প্রেমিক মরলো এবং তার শোকে প্রেমিকাও মরলো

বর্তমানে উপন্যাস বিশ্লেষকরা চরিত্রকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কারণ উপন্যাস যেহেতু মানব জীবনের বিশ্লেষণ এবং তার সম্পূর্ণ বিকাশ ও প্রকাশ। চরিত্রকে কেন্দ্র করে তার আচার-আচরণ, সমাজ, পরিবেশ, ভাবনা, আবেগ ইত্যাদি একাধিক বিষয় আবর্তন করে। অতএব চরিত্রও উপন্যাসের একটি মুখ্য উপাদান হিসাবে বিবেচিত হয়।

আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন—

> "... নামতে হল মনের সংসারের সেই কারখানা ঘরে যেখানে আগুনের জ্বলুনি হাতুড়ির পিটুনী থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। সাহিত্যের নব পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো"[১]

যা ঘটে গেছে বা যা ঘটছে তার বর্ণনা বিশ্লেষণ লেখকের কাছে যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার থেকেও অধিক গুরুত্বপূর্ণ হল যা ঘটতে পারে, বা যা ঘটা সম্ভব। আঁতের কথা বের করতে গেলে ব্যক্তির মনে প্রবেশ করতে হয়। সে কাজ করতে হয় লেখককেই। তাই লেখককে চরিত্রের সাথে একাত্ম হয়ে যেতে হয়। কখনও লেখক নিজে চরিত্র হয়ে ঘটনার বিবরণ দেন, আবার কখনও লেখক বাইরে থেকে দর্শকের ভূমিকা পালন করেন। অর্থাৎ লেখক কখনও উত্তম পুরুষ আবার কখনও প্রথম পুরুষের ভূমিকা পালন করেন। সময় উপন্যাসের একটি প্রয়োজনীয় উপাদান। সময়ের সাথে সাথে সমাজ পরিবেশ নীতি নৈতিকতা কর্তব্য ইত্যাদি সব কিছু পালটে যায়। তাই সময়ের পরম্পরা বজায় রাখা অবশ্য কর্তব্য। চরিত্রকে কথা বলানো বা মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য ভাষা অবশ্য প্রয়োজন। একাধিক চরিত্র, তাদের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান, ভিন্ন পরিবেশ, ইত্যাদির নিরিখে তাদের ভাষাও ভিন্ন হবে। উপন্যাসিকের কাজ সেই ভিন্নতার সামঞ্জস্য বজায় রেখে রচনা করা।

উপন্যাসের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত তৈরি করা যায় নি। তবে কিছু কিছু বৈশিষ্টের নিরিখে উপন্যাসকে চিহ্নিত করা হয়। কিছু কিছু স্বীকৃত বৈশিষ্ট আমরা এখানে উল্লেখ করছি —

উপন্যাস অবশ্যই গদ্যে রচিত হবে।

একটি মূল কাহিনি থাকবে এবং তার সাথে একাধিক উপকাহিনি কার্য কারণ সম্পর্কে যুক্ত থাকবে।

যেহেতু কাহিনি অনেক তাই চরিত্র সংখ্যা অধিক হবে এটাই স্বাভাবিক।

কাহিনি, চরিত্র, প্লট এই তিনটি অঙ্গের সামঞ্জস্য বজায় রাখাও জরুরি।

কাহিনি উপযুক্ত স্থানে সঠিক সময়ে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে পরিবেশন করা হবে।

বিষয়, চরিত্র, পরিবেশ, অঞ্চল ইত্যাদি বিষয় মাথায় রেখে সময় উপযোগী ভাষা ব্যবহার করা হবে।

উপন্যাস শুধু মাত্র গল্প নয়, তার অতিরিক্ত আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫) দিয়ে পথ চলা শুরু ঐতিহাসিক বাস্তব প্রেক্ষাপটে, কল্পনার অসম্ভব বিচরণ, চরিত্র চিত্রন, ঘটনা পারম্পর্য ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ে অভিনবত্ব দাবি করতে পারেন খুব সংক্ষেপে যদি দুর্গেশনন্দিনীয় বিষয়ের দিকে নজর দিই তাহলে দেখতে পাব পটভূমি হিসাবে ওড়িষার অধিকার নিয়ে মোগল পাঠান যুদ্ধ এটি কঠোর ইতিহাসের বিষয় এর সঙ্গে কল্পনার মাধুরি মিশিয়ে তৈরি করলেন তিলোত্তমা নামের একটি নারী। তিনি এই উপন্যাসের উত্তম পুরুষ, আর এই পুরুসেরই কাহিনি বিস্তার মূলত চারটি চরিত্রের দ্বন্দ্ব সংঘাতে প্রতিভাত হয়েছে, তিলোত্তমা, জগৎসিংহ, আয়েষা, ওসমান। গল্প এবং রসের প্রাধান্যের প্রসঙ্গে যথাক্রমে তিলোত্তমাও আয়েষার কথা বলেছেন। এই দুই চরিত্রের মধ্যে নায়িকা চরিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল তরুণী নায়িকার প্রতিনিধি হিসাবে তিলোত্তমাকে বিভিন্ন বিশ্লেষণে বিশেষিত করলেন বঙ্কিম, যেমন— 'লজ্জামুকুলিত অস্ফুটবাক্ অনতিরূঢ়যৌবন' ইত্যাদি। এভাবে তিলোত্তমা চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি মননে নিজের জায়গা প্রতিষ্ঠা করলেন। অপরপক্ষে আয়েষা বিলিতি কেতা দুরস্থ হলেও সম্পূর্ণ অচেনা নয় তিনি আবার মহাশ্বেতাকে বাণভট্টের একটি চরিত্রের সাথে তুলনা করে ফেললেন। বঙ্কিম সৃষ্ট নায়িকা দুটির গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে সুকুমার সেন ''তিলোত্তমার প্রাধান্য গল্পের পক্ষে আয়েষার প্রাধান্য রসের পক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার প্রথম বাংলা উপন্যাসে এই যে দুইটি নাইকা-টাইপ সৃষ্টি করিলেন তাহা বাংলা উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। লজ্জামুকুলিত অস্ফুটবাক্ অনতিরূঢ়যৌবন তিলোত্তমা বাংলা উপন্যাসের তরুণী নায়িকার প্রতিনিধি। তিলোত্তমা সৃষ্টি করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী পাঠকের চিত্ত জয় করিয়াছিলেন আয়েষা বিলাতি ছাঁচে ঢালা, তবুও আয়েষা অপরিচিতা ও বিদেশিনী নয় ধীরমহিমায় এবং আত্মসমাহিত চিত্ততায় বঙ্কিমচন্দ্রের আয়েষা যেন বাণভট্টের মহাশ্বেতার ভগিনী''।

Ralph Fox উপন্যাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে 'The Novell and the people' গ্রন্থে বলেছেন ,-'The Novel is the epic form of our modern bourgeais society,...It did not exist, except in very rudimentary from, before that modern civilisation which began which the rennaissance and like evry new art form it has served its purpose of extending and deepending human consciousness.' উপন্যাসের বিষয়ের প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, 'the novel is not merely fictional prose, it is the prose of man's life first art to take the whole man and give him expression.' আবার 'man's life, এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, 'Indeed the lliad is more a picture of the society then of any one of its cheracters, a society in which the individual dose not feel himself in opposition of the collective, any more then he feels himself in conflict with nature, He is part of his society, and at most a part of nature, of else dominated by nature, but never is in confict with it or master of it.' এই শর্ত যা উপন্যাস নির্মাণে প্রয়োজন তা কিছুটা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী তে পালন করেছেন বলেই মনে হয়। তিলোত্তমার জন্ম সমাজনিন্দিত জগৎ সিং এর সাথে তাঁর গোপন প্রণয়, অন্যদিকে জগৎ সিং এর কাছে আয়েশার গোপন আত্মসমর্পণ কাহিনিতে জটিলতার সৃষ্টি করেছে। সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে আয়েষার স্থান পদ্মফুলের মতো, তাই ঔপন্যাসিক তার বয়ান অনুযায়ী আয়েষার প্রতি পাঠকের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চান। এটা হয়তো ঔপন্যাসিকের আরোপিত দৃষ্টিভঙ্গী, কিন্তু, আকর সমগ্র উপন্যাসটি আবর্তিত হয়েছে তিলোত্তমা-কে ঘিরে। উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদ আয়েষা অংশে লেখক নিজেই স্বীকার করেছেন 'যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা মধ্যে তেমনই আযেয়া; এজন্য তাঁহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যান-প্রাপ্য করিতে চাহি'। একথা উচ্চারণের ঠিক আগেই লেখক আয়েশার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তবে কী লেখক অজান্তে অবচেতনে পাঠককে বাধ্য করছেন আয়েশার প্রতি অতিরিক্ত দৃষ্টি দিতে? কিন্তু আমরা যদি কাহিনির দিকে দৃষ্টি ফেরাই তাহলে দেখতে পাই কাহিনি আবর্তিত হয়েছে

তিলোত্তমা কে কেন্দ্র করে।

বাংলা সাহিত্যের পূর্বআধুনিক যুগে যা কিছু রচিত হয়েছে তা পদ্য আকারে। গদ্যের আর্বিভাব হয় আঠারোশ শতকে। তাহলে প্রশ্ন উঠতেই পারে, এর পূর্বের সব রচনাই কী কবিতা? উত্তরে বলতে পারি না। যেহেতু সেই সময় গদ্য রীতির কথা অজানা ছিল তা গদ্যে প্রকাশযোগ্য বিষয় ও পদ্যে প্রকাশ পেয়েছে। এর দৃষ্টান্ত হিসাবে মধ্যযুগের আখ্যান কাব্যগুলির নাম করতেই পারি। যেমন, মনসামঙ্গল কাব্য, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, প্রভৃতি। মঙ্গল কাব্যগুলি পদ্যে লিখিত হলেও বিষয়ের দিক থেকে উপন্যাস সমতুল্য। একথা বর্তমানে অনেক সাহিত্য বিশ্লেষকই স্বীকার করে নিয়েছেন। উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তার প্রকাশ কাব্যিক ভাষায় হওয়া সম্ভব নয়। যদিও উপন্যাসের ধারনা আমাদের নিজস্ব নয়। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নভেল থেকেই বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব। আঙ্গিক যখন নকল করা তার বিষয় ও অনুকৃত হবে এটা ধরে নিতেই পারি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখতে পাই চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গল কাব্য ইত্যাদি সবের মধ্যেই ধর্মের, দেব দেবীর অর্থাৎ তথাকথিত ভগবান নামক বস্তুটির ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে চর্যাপদের বিষয়টি একটু আলাদা। এগুলি মূলত সাধন সঙ্গীত। সাধনার গোপনীয়তা রক্ষার্থে সাংকেতিক ভাষায় এগুলি রচিত। তবে এর বাইরের বিষয় তৎকালীন সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি সবকিছুকেই তুলে ধরে। তবে মধ্যযুদের আখ্যান কাব্যগুলিতে একটি নিটোল কাহিনি আছে। তার শুরু আছে শেষ আছে। তবে এগুলি সবই দেব দেবীর প্রচার গাথা। মানুষ সেখানে বিশেষ শক্তিশালী ভূমিকা করতে পারে নি। এর কারণ হিসাবে অবশ্য তৎকালীন বাঙালির ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের অভাবকেই চিহ্নিত করেছেন বিশেষজ্ঞরা।

এখানে আমরা তথাকথিত আধুনিকযুগের কথা বলতে পারি। শ্রীরামপুর মিশ্রন প্রতিষ্ঠা হবার পর কিছু বাঙালি পণ্ডিত গল্প, কথোপকথন, রচনায় মনোনিবেশ করেন। তবে বেশির ভাগটাই ছিল অনুবাদ এবং উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষায় শিক্ষিত করে তোলা। ফলে সাহিত্যিক উৎকর্ষে তা বিশেষ তাৎপর্যবাহী হয়ে ওঠেনি। তবে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) এ গিয়ে আমরা প্রথম উপন্যাস লক্ষণা দেখতে পাই। যদিও

এটিকে আমরা স্বার্থক উপন্যাস হিসাবে মান্যতা দিই না। যদিও এর পিছনে ঔপনিবেশিক শাসনের বিষ বীজ লুকিয়ে আছে। বাংলা উপন্যাসের মাপকাঠি নির্ধারিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে। আবার তিনি অনুসরণ করেন ইংরেজি 'নভেল' এর আদর্শ। তবুও সমস্ত সমালোচনার উর্দ্ধে গিয়ে বলতে পারি বাংলা উপন্যাসের স্বার্থক সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে।

> ''ইংরেজি নভেল এর উল্ল্যেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল ক. কাহিনি সম্পূর্ণ বা অংশত কাল্পনিক হবে, খ, ঘটনাবলী বাস্তব আথবা বাস্তবানুগ যুক্তিযুক্ত হবে, গ, চরিত্রচিত্রন স্বাভাবিক আর্থাত কালোচিত এবং সম্ভবপর (কাল আধুনিক নাও হতে পারে) ঘ, আকারে ছোট নয়,''[২]

বঙ্কিমের উপন্যাসে উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে সবকটি না হলেও এক বা একাধিক বৈশিষ্ট্য তাঁর প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই লক্ষ করা যায়। তবে তিনি 'নভেল' এর অন্ধ অনুসরণ করেননি। তবে জোর করে তাকে অস্বীকার ও করেননি। নভেল কে সামনে রেখে বাংলার নিজস্ব রীতি সম্পৃক্ত বাংলা উপন্যাস গড়ে তুলেছেন। তাঁর উপন্যাসের আর একটি দিক লক্ষ করলে আমরা দেখতে পাই তার প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসের আখ্যান বস্তু তৎকালীন বাংলা দেশের সীমা ছাড়িয়ে যায় নি। ব্যতিক্রম হিসাবে 'রাজসিংহ'র নাম করতে পারি। বঙ্কিম উপন্যাসে আখ্যান ভাগ লক্ষ করলে দেখা যায় তিনি বাস্তবের তুলনায় কল্পনার উপরই বেশি জোর দিতে চেয়েছেন। এরজন্য তাকে বাস্তব কে অস্বীকার করতে হয় নাই। তার ঐতিহাসিক কাহিনি সমৃদ্ধ রচনাগুলির সার্থকতা তারই প্রমাণ দেয়। প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাস হিসাবে আমরা 'দুর্গেশনন্দিনী'র নামই সর্বজন স্বীকৃত। বঙ্কিম ইংরাজি নভেল কে অনুসরণ করেছেন অনুকরণ করেননি তার একটা কারণ হল বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে পূর্বে কিছুটা হলেও তৈরি ছিল। দুর্গেশনন্দিনী ও তার ব্যতিক্রম নয়। স্কটের আইভ্যানহোর অনুসরণে এটি রচিত বলে মেনে নিলেও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অঙ্গুরীয়-বিনিময় এর প্রভাব অস্বীকার করতে পারি না। অঙ্গুরীয় বিনিময় এর শাহজাদী রোসিনারা দুর্গেশনন্দিনীর নবাবজাদী আয়েশার অপূর্বরূপ, শিবাজী জগৎসিংহের, রামদাস স্বামী অভিরাম স্বামীর। দুর্গেশনন্দিনীর ঘটনাও তৎকালীন বাংলাদেশের।

বৈষ্ণব সাহিত্যের পূর্বরাগ তার উপন্যাসে রোম্যান্টিকতার বাহক হয়ে দেখা দিল। অনেকেই এটিকে ইংরেজি নভেলর অনুকরণ বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু পূর্বরাগতো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তার সার্থক প্রয়োগ প্রথম লক্ষ করা যায় বঙ্কিম উপন্যাসে। অনেক সাহিত্য সমলোচক বঙ্কিম এর রচনায় স্কটের রচনার অনুসরণের কথা বলে থাকেন, এই মত পুরোপুরি অস্বীকার করা যায় না আবার সর্বৈব সত্য বলে মেনেও নেওয়া যায় না। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় স্কটের প্রভাব একটু বেশি থাকলেও পরের দিকের রচনায় তা অনেকটা ফিকে হয়ে যায়।

বঙ্কিম পূর্ব রচনা হিসাবে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) উল্লেখযোগ্য গদ্য রচনা। বলতে পারি ইনিই বাংলা উপন্যাসের পথপ্রদর্শক। জনৈক সমলোচকের ভাষায়, ইনিই বঙ্গভাষানুরাগীদিগের অন্তর হইতে 'বারাণসী নগরে প্রতাপমুকুট নামে', 'মিথিলা নগরে গুণাধিপ নামে' ইত্যাদি প্রকার পরম্পরাগত গৌরচন্দ্রিকাপ্রিয়তা দূর করিয়াছেন, এবং পাঠকসমূহকে নিতান্ত বালকগণের শ্রবণ-প্রিয় পিতামহীকথিত এক রাজা তার দো সো রাণীর গল্পের ন্যায় গল্প পাঠে অনর্থক কালাতিপাত হইতে নিবৃত্ত করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। আলালের ঘরের দুলাল যে বিশেষ উদ্দেশ্যে লেখা তা তার নাম থেকেই অনুমান করতে পারি। সুকুমার সেন এটিকে উপন্যাস না বলার পিছনে বেশ কতগুলি যুক্তি খাড়া করেছেন। ক. প্লঅবিন্যস্ত খ. মূল কাহিনি অবাস্তব ঘটনায় পরিপূর্ণ। গ. বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সূচনা অস্পষ্ট। ঘ. নারী চরিত্রগুলি ভীষণভাবে অবহেলিত। ঙ. সমগ্র উপন্যাসে প্রণয় রসের যে গভীরতা তা একেবারেই লুপ্তি। এই সকল কারণে সুকুমার সেন প্যারীচাঁদ মিত্রের আলালের ঘরের দুলালকে তিকেন্সের 'পিকউইক পেশার্স'এর সাথে তুলনা করেছেন। আরো বলেছেন, এই রচনা মূলত ''এপিসোড'' বা অবান্তর আখ্যানগুলির মনোজ্ঞতা এবং ভূমিকা চিত্রগুলির বর্ণোজ্জ্বলতা তুলে ধরা।

তবে আমরা আলালের ঘরের দুলাল এর আখ্যান ভাগ বিশ্লেষণ করে অল্পবিস্তর ব্যাখ্যা করতে পারি। এর কাহিনিটি সর্বমোট ত্রিশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। অধ্যায়ের শুরুতে একটি অভিনব প্রয়াস লক্ষ করা গেছে তা হল প্রত্যেকটি অধ্যায়ের সূচনায় একটি করে দীর্ঘ ব্যাখ্যাধর্মী নাম বা

পরিচয় পত্র আছে। এগুলি ঐ অধ্যায়ের ঘটনার সারসংক্ষেপে। এর থেকে আমরা অনুমান করতেই পারি লেখকের মনেও হয়তোবা সন্দেহ কাজ করেছে যে কাহিনির ধারা হারিয়ে যেতে পারে তাই তিনি ঘটনা শৃঙ্খলা তৈরি করে কাহিনিকে সংগঠিত করতে চেয়েছেন। উপন্যাসের স্বরূপ বৈশিষ্ট্য সম্পর্ক পূর্বে উল্লিখিত বিষয় আবার স্মরণ করছি। উপন্যাসে সাধারণত একটা ঘটনা বা কাহিনি থাকে। উপন্যাসের থিম বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী উপন্যাসে ঘটনা ও দৃশ্য, চরিত্রগুলির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কার্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে। আর এরই মাধ্যমে উপন্যাসের কাহিনি সঠিক রূপ নেয়।

উপন্যাসের কাহিনি সংক্ষেপের দিকে নজর ফেরালে দেখতে পাই বৈদ্যবাটির জমিদার বাবুরামবাবুর পুত্র মতিলাল অল্পবয়স থেকেই উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনে অভ্যস্ত। কুসঙ্গ এই উচ্ছৃঙ্খলাকে আরো বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করেছে। শেষে কপর্দক শূন্য অবস্থায় সঙ্গীদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। দুর্গতি ও লাঞ্ছনা ভোগ করার পর মতিলালের চরিত্রের পরিবর্তন হয়। সে সৎপথে ফিরে আসে শেষে মা বোন, ছোট ভাই রামলাল বিমাতা ও নিজের স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে বৈদ্যবাটিতে ফিরে যায় এবং পরম সুখে জীবন যাপন শুরু করে— এটাই আলালের ঘরের দুলাল এর মূল কাহিনি। নায়ক মতিলাল কে কেন্দ্র করেই গল্পের নির্মাণ আবার এমন কিছু অংশ আছে যার সাথে মতিলাল ঘটিত মূল কাহিনির সম্পর্ক আমাদের নজরে পড়ে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য বাবু রামবাবুর দ্বিতীয় বিয়ে। গল্পে তিনি পত্নীপরায়ণ বলেই পরিচিত তার দ্বিতীয় বিবাহ চরিত্রের পক্ষে বেমানান আবার মতিলাল কেন্দ্রীক বর্ণনায় এই প্রসঙ্গ উপস্থাপন গল্পের পক্ষে বেমানান। এই রকম একাধিক চরিত্র ও ঘটনা ক্ষণিকের জন্য এসেছে আবার চলে গেছে পাঠক মনে দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী হতে পারেনি।

সময়ের হাতধরে মনুস্য সমাজ এবং তার আশেপাশের ঘটনার পরিবর্তন ঘটে। ঘটনাক্রমের সাথে সাথে পরিবর্তন ঘটে সমাজ সংস্কৃতি আচার ব্যবহার অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতির। আর এসবের প্রভাব কখনও প্রত্যক্ষে আবার কখনও পরোক্ষে সাহিত্যের উপর এসে পড়ে, কারণ সাহিত্য সমাজ বহির্ভূত নয়। সমাজে খুঁটিনাটি পরিবর্তন সাহিত্যের বিষয়ের পরিবর্তন ঘটায় কোন সচেতন শিল্পী এই পরিবর্তনকে অগ্রাহ্য করে তাঁর শিল্প কর্মকে রূপ দিতে

পারেন না। পূর্বেই উল্লেখ করেছি উপন্যাসের আবির্ভাব ইংরাজি নভেল এর হাত ধরে তাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম দিকের উপন্যাসে ইংরাজি প্রভাব পড়বে এটাই স্বাভাবিক। আবার সময়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই গদ্যের আবির্ভাব ইংরেজ শাসনাধীন বাংলায়। এর উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষা দান। তাই সেখানে বাংলা বা বাঙালির প্রভাব যে খুব অল্প মাত্রায় পড়বে এ ব্যাপারে সন্দেহ থাকার কথা নয়। শ্রীরামপুর মিশনে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গদ্য রচনার পাকাপাকি শুভারম্ভ বলতে পারি। সেই সময়ে মূলত অনুবাদের কাজেই ব্যবহৃত হয়। কারণ ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা শেখানোর পাশাপাশি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। তাই গদ্যের উন্নতির দিকে বিশেষ নজর তাদের ছিল না। বাংলা সাহিত্যের নবতম প্রকরণ হিসেবে আমরা যে উপন্যাসের কথা বলছি তার প্রথম প্রয়াস লক্ষ্য করি ভাবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবু বিলাস' (১৮২৩) এ, এছাড়াও 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৫) 'নববিবি বিলাস' (১৮৩১) ইত্যাদি একাধিক রচনায় এই প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় কিন্তু স্বার্থকতা লাভ করতে পারেনি। এগুলি মূলত ব্যঙ্গত্মক নক্সা জাতীয় রচনা। তৎকালীন সমাজকে ব্যঙ্গ করেই এগুলি রচিত হয়েছিল তবে প্রয়াস যে সঠিক ছিল তা বুঝতে পারি আর এক রচনাকারের প্রয়াস থেকে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' এর ছায়া যেন আমরা দেখতে পাই বঙ্কিম এর 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যা বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্বার্থক উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে উপন্যাসের আখ্যান ভাবনারও পরিবর্তন হয়েছে। একজন লেখকের প্রথম ও শেষ জীবনের রচনার মধ্যে মিল পাওয়া যায় না। সেটা ভাষা ও আখ্যান উভয় দিক থেকেই। আমরা যদি 'বউঠাকুরাণীর হাট' ও 'শেষের কবিতা'র মধ্যে আলোচনা করি তাহলেই ব্যাপারটি পরিস্কার হয়ে যাবে। আবার বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র সাথে যদি 'বিষবৃক্ষ'র তুলনামূলক আলোচনা করি তাহলে তাদের ভাব ভাষা ইত্যাদির যে আমূল পরিবর্তন তা খুব সহজেই চোখে পড়বে । এটাতো একই ঔপন্যাসিকের বিভিন্ন সময়ের উপন্যাসের আখ্যানের মধ্যে পার্থক্য। অন্যভাবে দেখা যায় বিভিন্ন ঔপন্যাসিক বিভিন্ন সময়ের উপন্যাসে আখ্যানের পরিবর্তন কিভাবে ঘটিয়েছেন।

বঙ্কিম পরবর্তী উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে যার নাম হয় তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বঙ্কিম যুগের শেষ আর রবি যুগের শুরু এই মধ্যবর্তী সময়ে অনেক লেখকই উপন্যাস রচনায় নিযুক্ত হয়েছেন। পাঠক সমাদরও পেয়েছেন অনেকেই। কিন্তু তাঁরা কেউই স্বার্থক উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে সমাদর লাভ করতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ প্রকাশিত 'সীতারাম' (১৮৮৭) এই সময় কালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয় যথা 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩), এবং 'রাজর্ষি' (১৮৮৭), দুটি উপন্যাসই ঐতিহাসিক প্রেক্ষপটে লেখা। প্রথমটির সাথে বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস ভাবনার কিছু মিল থাকলেও 'রাজর্ষি'তে সম্পূর্ণ অন্য রূপ দেখতে পাই। আমরা দুটি কাহিনির দিকে যদি অল্পবিস্তর নজর দিই তাহলে কিছুটা ধারণা হতে পারি। মূলত রাজা প্রতাপাদিত্যকে কেন্দ্র করেই 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' কাহিনি বিস্তার। রাজনীতিবিদ প্রতাপাদিত্য, মানবিক গুণ সম্পন্ন বসন্ত রায়, উদয়াদিত্য ও বিভা চরিত্র অঙ্কণে বঙ্গাধিপ পরাজয় এর ছায়া দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন, একসময়ে বাংলাদেশের আদর্শ বীর হিসাবে প্রতাপাদিত্যকে মর্যাদা দেওয়া হোত। কারণ ছিল অপ্রয়োজনীয় দেশাত্মবোধ। যদিও বর্তমানে ও এই খ্যাতির ঔজ্জ্বল্য খুব একটা মলিন হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে ইতিহাস খুঁজে প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে যা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, তাতে যে সত্যটা উঠে আসে ও অনেকটা এইরকম, তিনি অত্যন্ত উদ্ধত, নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করার ঔদ্ধত্য দেখালেও আসলে তার ছিল ক্ষমতাহীন আস্ফালনের গর্ব। তৎকালীন ঐতিহাসিকদের ওপর দেশভিমানের প্রভাব ছিল না। লেখকের মনে যে দেশপ্রেম প্রবল ছিল তা আমরা কাহিনি কল্পনা থেকে কিছুটা হলেও অনুমান করতে পারি। ইতিহাস কল্পনার খোঁজে ভারতের বাইরে যাননি। বর্তমান বাংলাদেশের যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্য। তিনি রাজ মেজাজ যুক্ত, তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র উদয়াদিত্য ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত স্বভাবের। সেই কারনেই পিতা-পুত্রের মানসিক সংযোগ ছিল না। পুত্রের প্রতি পিতার অসন্তোষ ও বিদ্বেষ এত অধিক মাত্রায় ছিল যে শেষ পর্যন্ত পুত্র মানসিক অবসাদ গ্রস্ত হয়ে পড়েন। অনেক সমলোচক মনে করেন রবীন্দ্রনাথের নিজের জীবনের প্রভাব সম্বলিত চরিত্র উদয়াদিত্য। এই উপন্যাসের আখ্যান যে লেখকের ও মনঃপুত হয়নি তা আমরা বুঝতে পারি যখন তিনি একই কাহিনি অবলম্বনে লিখলেন নাটক 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯)। সেখানে অনেক ত্রুটিও সংশোধিত হয়েছে, যেমন বধূবিদ্বেষ-প্রণোদিত

নিষ্ঠুরতার পরিবর্তে রাণীর নির্বুদ্ধিতাই সুরমার অপমৃত্যুর হেতু দেখানো এবং উদয়াদিত্য-রুক্মিণী (মঙ্গলা) সীতারাম কাহিনিটুকু বাদ গিয়াছে। প্রতাপাদিত্য অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল ১৮৮৩ সালে উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার প্রায় পঁচিশ বছর পর পুণঃ নির্মাণ হল তাঁরই হাতে কিন্তু অন্য আঙ্গিকে। ঠিক এর পরই প্রকাশিত হল 'রাজর্ষি' এখানেও সেই একই ছাঁচ প্রায় একই বিষয়। স্থানের পরিবর্তন ঘটেছে আগে ছিল যশোরের রাজা এখন হল ত্রিপুরার রাজা এখানেও ইতিহাসের প্রেক্ষপটকে বাৎসল্যের মোড়কে মুড়ে পরিবেশন করেছেন। 'রাজর্ষি' রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন, 'দুই এক সংখ্যা বালক বাহির হইবার পর দুই এক দিনের জন্য দেওঘরে রাজনারায়ণ বাবুকে দেখিতে যাই। কলকাতায় ফিরিবার সময় রাত্রের গাড়িতে ভিড় ছিল, ভালো করিয়া ঘুম হইতেছিল না ঠিক চোখের উপর আলো জ্বলিতেছিল। মনে করিলাম ঘুম যখন হইবেই না এই সুযোগে বালকের জন্য একটা গল্প ভাবিয়া রাখি। গল্প ভাবিবার ব্যর্থ চেষ্টার টানে গল্প আসিল না, ঘুম আসিয়া পড়িল। স্বপ্ন দেখিলাম, কোনো এক মন্দিরের সিঁড়ির ওপর বলির রক্তের চিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে— বাবা, একি! এযে রক্ত! বালিকার এই কাতরতায় তাহার রূপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথবা বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল এটি আমার স্বপ্নরূপ গল্প। এমন স্বপ্নে পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজার গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি গল্পের মূল বিষয় মন্দির প্রাঙ্গণে রক্ত দেখে বালিকার করুণ আর্তি। বহির্ঙ্গ হিসাবে ত্রিপুরার রাজ পরিবার ও তার কাহিনিকে বেছে নিয়েছেন। গল্পের একটা অংশ স্বপ্নের অন্য অংশ বাস্তবের। আবার অন্য দিক থেকে দুটি অংশই বাস্তবের কারণ পশু বলির বাস্তবতা আমরা অস্বীকার করতে পারি না অন্য দিকে ত্রিপুরা এবং তার রাজপরিবার ও চাক্ষুস। এখানে আমরা লেখকেরও দুটি বিপরীত মানসিক অবস্থানের পরিচয় পাই। অনুরূপ বিষয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থেও লক্ষ্য করি।

এই দুটি রচনার মধ্যে অপ্রাপ্তবয়স্ক লেখকের আবেগই প্রধান হয়ে উঠেছে। এর পর দীর্ঘ

ষোল বছর আর কোন উপন্যাসই আমরা পাই না। সুপ্ত আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎগীরনের ন্যায় দীর্ঘ দিন চুপ থাকার পর আমরা যে উপন্যাসটি পাই তা বাংলা উপন্যাসের পট পরিবর্তন সূচিত করে। এতদিনের মিথকে ভেঙে এক নতুন নির্মাণ পদ্ধতির পথ দেখান। এতদিন চরিত্রের মনের কথা লেখক বা উপন্যাস কথক বলে দিতেন কিন্তু এখানে আমরা দেখলাম নিজের মনের কথা চরিত্র নিজের মুখেই ব্যক্ত করেছে। কাহিনীর দিক থেকে মূলত ত্রিকোণ প্রেমের কাহিনি। তবে শুধুমাত্র প্রেম বলে দায় সারা যায় না। তৎকালীন সমাজ, নারীপরিসর, নারীশিক্ষা, সমাজ অবৈধ প্রেম, সবকিছুই বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে অত্যন্ত কৌশলে ব্যক্ত করেছেন। উপন্যাসের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন বঙ্গদর্শনের নতুন পর্যায় রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজনৈতিক, চিন্তার সাথে সাথে প্রাধান্য পেয়েছিল গল্প ও মানব চরিত্রের কঠিন সংস্পর্শের গল্প সাহিত্যের এই নতুন ধারায় পদ্ধতি হল ক্রম পর্যায় অনুযায়ী বিবরণ দেওয়া এবং তাদের একেবারে হৃদয়ের অন্তঃস্থলের গোপন কথা টেনে বার করে আনা। এই পদ্ধতিতে প্রথম লেখেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে। আর এর পরিমার্জিত রূপ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'চোখেরবালি' (১৯০৩)তে। রবীন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য দেখাতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র তার কাছে ব্যক্তি নয় সমাজ বড়। সমাজের প্রয়োজনে ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাতেও তিনি পিছপা হন না তা কৃষ্ণকান্তের উইল এ রোহিনী কে প্রত্যক্ষ করলেই বুঝতে পারি। শুধুমাত্র সমাজের প্রয়োজনে রোহিনীর মত চরিত্রকে বিনা দোষে বা অল্প দোষে মৃত্যুর মত শাস্তি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। একে বলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড। তিনি যে বিধবা বিবাহ কে মেনে নিতে পারেননি তা 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেছেন। অতএব তিনি অতটা শাহস দেখাতে পারেননি। কিন্তু এখানে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের বিকাশে সামাজিক বিধিনিষেধের লঙ্ঘন হতেই পারে। মহেন্দ্র আশা এবং বিনোদিনী বিহারী সমস্যা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের বিজয় সূচনা করেছে। অবচেতনার যন্ত্রণা এবং দৈহিক চাহিদা এখানে শিল্প স্বার্থকভাবে রূপায়িত হয়েছে। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন চোখের বালি-কে উপন্যাস সাহিত্যে নতুন যুগের সূচনা করেছিল। আধুনিক উপন্যাসগুলিতে 'বাস্তবতা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হোত। 'চোখের বালি' উপন্যাসে এর সূচনা ঘটে। ন্যায় নীতি বিচারের তুলনায় তথ্য অনুসন্ধানও মনস্তত্ত্বের তাৎপর্য এই উপন্যাসে প্রধান

লক্ষ। চোখের বালি এই ভিন্ন বিচারের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে পাথের করে এক শরৎচন্দ্রের যুগকে সুদৃঢ় বন্ধনে বেঁধেছেন। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, ''মনস্তত্ত্বমূলক নতুন পদ্ধতির প্রবর্তক রবীন্দ্রনাথ''। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের তুলনা করতে গিয়ে সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—এই দুই উপন্যাসের কাহিনির মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে, কিন্তু এদের মধ্যে যে দুটি ট্র্যাজেডীয় চিত্র আছে তারা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। নগেন্দ্রনাথ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর জীবনে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তা বাইরের কোনো ঘটনার দ্বারা জটিল হয়নি। গোবিন্দলালের অধঃপতন প্রতিপদে নির্ভর করেছে বাইরের ঘটনার ওপর। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শুধু যে ব্যক্তিগত জীবনের ট্র্যাজেডীয় চিত্রঙ্কন করেছে তা নয়। বাঙালি হিন্দু পরিবারের বিস্তৃত বিবরণও এইখানে নিবন্ধ হয়েছে এবং পারিবারিক প্রতিবেশ কেমন করেন ব্যক্তির জীবনকে প্রভাবান্বিত করতে পারে এইখানে তার প্রকৃষ্ট আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে ট্র্যাজেডীর যে তীব্র অনিবার্যতার চিত্র পাওয়া যায় তার তুলনা এইখানে নেই।"

বঙ্কিম ভাবনা যখন অস্তমিত, রবির তেজে সমস্ত বাংলা সাহিত্য জ্বলজ্বল করছে, ঠিক তখনই বাংলা সাহিত্য জগতে ক্ষুদ্র জ্যোতিস্কের ন্যায় আবির্ভাব ঘটে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি উপন্যাস রচনা করেছেন বাঙালির জীবনের সামান্য ক্ষুদ্র ঘটনা নিয়ে। যাকে আমরা সাধারণত ভাবে তুচ্ছ ঘটনা বলি তাই শরৎ উপন্যাসে হয়ে উঠেছে মুখ্য ঘটনা। তাঁর পূর্বসূরীদের উপন্যাসে যা একে বারেই অচ্ছ্যুত ছিল। তিনি বাঙালির গ্রাম সমাজ ও পরিবার জীবনের যে সব বিয়য়ের ওপর দৃষ্টি ফিরিয়েছেন তা পূর্ববর্তী উপন্যাসে বিরল। বঙ্কিম বা রবীন্দ্র উপন্যাসের ভাব ভাবনা উচ্চাঙ্গের তত্ত্ব প্রসূত। তাঁদের সৃষ্ট চরিত্ররা সবাই সমাজের উচ্চ স্থানে অবস্থান করে। সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির কোন ঠাঁই ছিল তাঁদের উপন্যাসে। মূলত ভাবনা প্রসূত ছিল তাঁদের উপন্যাস। তবে জীবনের প্রথম দিকে শরৎচন্দ্র যে বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন তা তিনি নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন। 'পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্ত হয়ে গেল। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়'। প্রথম জীবনে বঙ্কিম আঙ্গিক অনুসরণ করে আদি-মধ্য-অন্ত্য যুক্ত জীবন ভাস্য রচনা করার চেষ্টা করেছেন। বড়দিদি, দেবদাস, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি উপন্যাসে এই অনুকরণ বেশি মাত্রায়

লক্ষ্য করা যায়। তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসই প্রথম পুরুষে লেখা ব্যতিক্রম হিসাবে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নাম করতে পারি। এখানে উত্তম পুরুষের কথোপকথন চোখে পড়ে। সমলোচকেরা এটিকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসও বলেছেন। ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত, তাঁর জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে ক্ষেত্র গুপ্তের অভিমত, জনপ্রিয়তা কখনই সাহিত্য মানের মানদণ্ড নয়। জনসাধারণের রুচি, বিচার পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত মেনে নিলে যতরকম গোলমাল সৃষ্টি হয়। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ভাবা যায় না। তবে এই জনপ্রিয়তার পথ ধরে তাঁর জীবন জিজ্ঞাসা এবং শিল্পরীতির সূরূপ পরিচয় লাভ করা যেতে পারে জনপ্রিয়তার বিষয়ে একালে আর একটি ভাবনা দেখা দিয়েছে। কোনো লেখক স্বল্পকাল জনপ্রিয় থাকলে শিল্পগুনের দিক থেকে ভাবনার কিছু থাকে না। কিন্তু কোনো লেখকের রচনা যদি বহুকার ধরে— এমন কি তাঁর মৃত্যুর ৬০ বছর পরেও জনপ্রিয় থাকে তাহলে সমলোচক ব্যপারটাকে উড়িয়ে দিতে পারেন না। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে সেরকমই ঘটেছে। তাঁর দীর্ঘ— অতি দীর্ঘস্থায়ী জনপ্রিয়তা প্রমাণ করেছে তাঁর কাহিনি গুলির শিকড় জাতির জীবনের অতি গভীরে।

অর্থাৎ জনপ্রিয়তা সাহিত্যের বিচার্য বিষয় নয়, তবে শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রে খাটে না। কারণ সস্তা জনপ্রিয়তা যুগ যুগ ধরে টিকে থাকতে পারে না। তিনি মানব জাতির আপাত তুচ্ছ অথচ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গল্পের ছলে সুচারু রূপে পরিবেশন করেছেন, যা বাঙালির মনের কথা হয়ে উঠেছে। আজও বাঙালি পাঠক তাঁর উপন্যাস পাঠ করে চোখের জলে ভাসতে বাধ্য হয়। তাঁর উপন্যাসের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট স্বরূপ আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, তিনি অসাধারণ কবিত্বশক্তির ক্ষমতাধিকারী না হয়েও শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ শক্তি, চিন্তা ক্ষমতা ও সৃষ্টিতে রসের সিদ্ধহস্ত। তার এই অসাধারণ ক্ষমতার দ্বারা তিনি বঙ্গসমাজের শুষ্ক কঠিন মাটি থেকে উপন্যাসরসের উৎস সন্ধান করে তার পথ সুপ্রাস্তে করেছেন, পারিবারিক জীবনের ক্ষেত্রেও তিনি গূঢ় ভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, নারী শক্তির যে ঐতিহ্যবাহী জড়তা, ত্যাগ, তিতিক্ষা দুর করে নারীকে তিনি তেজস্বী করে গড়ে তুলেছেন। তিনি বর্তমান সমাজের লিঙ্গ বৈষম্যের প্রতি তীব্র বিরোধিতা করে স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। নারী দুঃখ যেন ভগবানের দ্বারাই ক্রমবার্ধত হয়ে উঠেছে। সবশেষে তিনি প্রেমের জটিল তত্ত্বের প্রতি গভীর দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

সমাজের উচ্চকোটির মানুষজন অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক শাসনে বাংলার সাধারণ মানুষ কীভাবে জীবন অতিবাহিত করত তার সঠিক বর্ণনা শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে দিয়েছেন। শ্রেণি বিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থা, এক শ্রেণির মানুষ আর এক শ্রেণির মানুষের উপর অত্যাচার অবিচার ঘৃণা করেই চলেছে। লেখক উপন্যাসে তারই বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। 'পল্লিসমাজ' উপন্যাসকে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করতে পারি। উপন্যাসের প্রথম দিকে গ্রামের বিভিন্ন সমস্যা ও তার প্রতিকার স্থান পেয়েছে, কিন্তু দশম অধ্যায় থেকে উপন্যাসের দুই মুখ্য চরিত্র রমা এবং রমেশ, এদের প্রেম সম্পর্ক বর্ণিত হয়েছে যা উপন্যাসের আকর্ষণীয় শক্তি হয়ে উঠেছে। তবে এই প্রেম সম্পর্ক সমাজ নিষিদ্ধ, তাই এর আকর্ষণ এত প্রবল হয়েছে। তবে লেখক পল্লীসমাজব্যবস্থাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। রমা ও রমেশের প্রেমের সর্বোচ্চ পরিণতি দিয়ে বিধবার প্রেমকে স্বীকৃতি দেওয়ার সাহস দেখাতে পারেননি। ড. ক্ষেত্র গুপ্তর ভাষায়, প্রাধান্য পেয়েছে পরিবার এবং গ্রামজীবন ভিন্ন বিষয় বস্তু কে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমীই বলা যায়। এই ধরনের লেখার ছায়াপাত ঘটেছে— 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন' এবং 'দেনাপাওনা'র ঘটনা কেন্দ্র পল্লীসমাজ 'দেনাপাওনা'-র মূল ঘটনা পণ সংক্রান্ত হলেও এখানে মানুষের সামাজিক পারিবারিক এমনকী মনস্তাত্ত্বিকবিশ্লেষণ ও বিশ্লেষিত হয়েছে। কিন্তু সব কিছুর পরেও দেবতার গম্ভীর্যকে কেউ অস্বীকার করতে পারেননি। দেবীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ঘটনা, জীবনচর্যা এই গল্পে প্রধান্য পেয়েছে। এই দেব মন্দির তার ভৈরবীর মহিমান্বিত স্বীকৃতি, গ্রাম্য মানুষের মধ্যে দেবীর তথা—ভৈরবীর অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ বিশ্বাস, ভৈরবীর জীবনযাত্রার বিশিষ্ট এককত্ব এ কাহিনির ওপর এক নতুন আলোকপাত রয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটির ভাবচেতনার পশ্চাতে এই আলোকবিচ্ছুরণই সক্রিয়।

শরৎচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য পট পরিবর্তন লক্ষ্য করি 'পথের দাবী'তে। এটিকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলে দাবী করা হয়। একটা রাজনৈতিক ভাবধারা উপন্যাসের পটভূমিতে লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন সভা সমিতির উল্লেখ, স্বদেশীয়ানা বিভিন্ন গুপ্ত সমিতি উপন্যাসের রাজনৈতিক ভাবকে স্পষ্ট করেছে। 'পথের দাবী'র বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছে। এর মধ্যে দিয়ে ও এক অসাধারণ প্রেম কাহিনির ছবি আঁকা হয়েছে। বাস্তবের সমস্ত প্রেক্ষিতগুলি বেশ জমে উঠেছে। সুমিত্রা সম্পর্কে

আলোচনা করতে গেলে তার নির্বিকার কাঠিন্য তার চরিত্রকে কঠিন করে তুলেছে। এই কাঠিন্যই প্রেমের আবেশকে ঘনীভূত হতে দেয়নি। এই ব্যাপারটিকে অনেকটা Melodramatic ও বলেছেন। অতিনাটকীয় বাঙালি আদর্শ পুরুষের ছবি পাওয়া যায় অপূর্বর মধ্যে। এই অপূর্ব হয়তো লেখকের মানস কল্পনা। তবে এই অপূর্ব একেবারে মেরুদণ্ডহীন স্ত্রৈণ যদিও সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা খুব একটা প্রয়োজনীয় নয়। সমস্ত কিছুকে অতিক্রম করে গেছে সব্যসাচীর নরমে গরমে চরিত্রটি।

আমরা আগেই জেনেছি জনপ্রিয়তা কোনো উপন্যাসের সাহিত্য মূল্যের মাপকাঠি হতে পারে না 'পথের দাবী'র ক্ষেত্রেও একথা সত্য। উপন্যাসের নায়ক সব্যসাচী শুধু মাত্র ভাবের চরিত্র, তার কথা এবং কাজের মধ্যে বিস্তর ফারাক। চরিত্র হিসাবে বাস্তবতা হারিয়েছে সব্যসাচী। গল্প হিসাবে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস উৎকর্ষ এ বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর উপন্যাস কষ্টপাঠ্য নয়, পাঠককে বিশেষকিছু ভাবতে হয় না, শুধু মাত্র পাঠের মধ্য দিয়ে আনন্দ লাভই মুখ্য। গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর মতে— শরৎচন্দ্র এর রোমান্টিক মানুষের মানবিক চাহিদা পূরণের জন্য বিশেষ দক্ষতায় উপন্যাস রচনার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, মূলত সারাজীবনব্যাপী তিনি অনেকটা একই নিয়মে উপন্যাস রচনা করে গেছেন। কোনো রকম নতুন ধরনের প্রচেষ্টা তাঁর লেখার প্রধান হয়ে ওঠেনি। এখানেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রবীন্দ্র পরবর্তী শরৎচন্দ্রের পার্থক্য লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের ধারাকে যেমন বিভিন্ন পর্বে বা ধারায় বিন্যস্ত করা চলে, শরৎচন্দ্র তাঁর একই ঐতিহ্যবাহী ধারার ক্ষেত্রে অনড়। রবীন্দ্রনাথ সমসাময়িক উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে মানব চরিত্রের মননধর্মী রচনার নতুন ধারা সৃষ্টি করেলও শরৎচন্দ্র একই ধারা বজায় রেখেছেন। শরৎচন্দ্র উপন্যাসে একট বিশেষ দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি দিয়েছেন। নারীর প্রেম এবং দুঃখ,কে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। পূর্বসূরীরা নারীকে মূলত প্রেয়সী বা গৃহিণী রূপে দেখেছেন, তিনি কিন্তু পুরোনো রীতির অনুসরণ করেন নি। এই দুই সত্ত্বার সাথে আর এক গুরুত্বপূর্ণ সত্ত্বার দিকেও দৃষ্টি দিয়েছেন তা হল মাতৃ সত্ত্বা। তার নারীকে ব্যক্তিত্বময়ী করে তুলতে তথাকথিত শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি, বাঙালির পরিবার জীবনের প্রচলিত শিক্ষাই তাঁর নারীকে ব্যক্তিতময়ী করে তুলেছে বাংলা উপন্যাসে নারী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' প্রবন্ধের কিছু অংশ উল্লেখ করতেই হয়, বাংলা সাহিত্যে

দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য। কুন্দনন্দিনী এবং সূর্যমুখীর নিকট নগেন্দ্র ম্লান হইয়া আছে। রোহিণী এবং ভ্রমরের নিকট গোবিন্দলাল অদৃষ্টপ্রায়, জ্যোতির্ময়ী কপালকুণ্ডলার পার্শ্বে নবকুমার ক্ষীণতম উপগ্রহের ন্যায়। বঙ্গসাহিত্যে পুরুষ মহাদেবের ন্যায় নিশ্চল ভাবে ধূলিশয়ান এবং রমণী তাহার কক্ষের ওপর জীবন্তভাবে বিরাজমান। অর্থাৎ শিল্প সাহিত্যে নারী যুগ যুগ ধরে তার একাধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। আমরা যদি বঙ্কিম উপন্যাসে নারী, রবীন্দ্র উপন্যাসে নারী এবং শরৎ উপন্যাস নারীর দিকে তাকাই তাহলে বুঝতে পারব আখ্যানের পরিবর্তনের সাথে সাথে কীভাবে নারী চরিত্রের পরিবর্তন হয়েছে। বঙ্কিম সৃষ্ট নারী চরিত্ররা কেউ সেই অর্থে বিদ্যা শিক্ষায় শিক্ষিত নয়। উঠেছেন, যেমন বিনোদিনী কে আমরা দেখেছি। আবার শরৎ উপন্যাসে দেখি সম্পূর্ণ গ্রাম্য নারী। আমরা এখান থেকে বুঝতেই পারছি আখ্যান যেমন সময়ের সাথে সাথে পালটায়, তার সাথে সঙ্গতি রেখে চরিত্রের গঠনও পালটে যায়। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৬১) এর 'অন্তঃশীলা' (১৯৩৫) উপন্যাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ একটি চিঠিতে লেখেন, ''ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে তিনি জানান যে তাঁর মনন এবং চিন্তন এত গভীর এবং অধ্যবসয়ের দ্বারা সমৃদ্ধ তাতে তার ব্যাখ্যান আখ্যানকে শতধা বিদীর্ণ করেছে। আচরণের দিক থেকে এ যেন তাহারই চরিত কথা। খগেনবাবু কাহিনির সূত্রধর। তাঁরই স্মৃতির অনুভূতিতে কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এখানে খগেন রমলার সম্পর্ক, রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীশ ও দামিনীর সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস শিল্প রূপকে সমৃদ্ধ করেছে বন্দ্যোপাধ্যায় এয়ী। এখানে তাঁদের উল্লেখ যোগ্য কিছু উপন্যাস আলোচনা করবো। এদের মধ্যে প্রথমেই যাঁর নাম আসে তিনি হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৪-১৯৫০)। তাঁর পরিচয় জ্ঞাপক প্রথম উপন্যাস 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়কাল হওয়া সত্ত্বেও উপন্যাসের কোথাও বিরাট হাহাকার চোখে পড়ে না। যুদ্ধোত্তর সমাজ জীবন ক্ষতবিক্ষত, রোমান্টিক পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের ধারণা পালটে যাচ্ছে, পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটিতে পরিণত হয়েছে, এই রকম পরিস্থিতিতে বিভূতিভূষণ শিশু অপুর চোখে পৃথিবী দেখছেন। পুরোপুরি কল্পনার রাজ্যে ডুব দিয়েছেন। বাংলার মাঠ ঘাট পাখি ফুল গ্রাম নিয়ে উপন্যাস রচনা করে চলেছেন। বইটির বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল 'প্রকৃতির স্বাধীন আবহাওয়া একটি শিশুচিত্তকে

কীভাবে ধীরে ধীরে সংসার সংগ্রামের উপযোগী করিয়া তুলিতেছে তাহারই বিচিত্র ইতিহাস অপরূপ ভঙ্গিতে বলা হইয়াছে'। যে প্রকৃতির আবহাওয়া যুদ্ধের বারুদে বিষাক্ত সেখানে একটি শিশুমন তার জীবন সংগ্রামের রসদ সংগ্রহ করছে। জোর করে কোনো আখ্যান সৃষ্টি করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় না। এর সমর্থনে রবীন্দ্র উক্তি লিপিবদ্ধ করতে পারি। ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'পরিচয়' পত্রিকায় লিখেছেন, 'পথের পাঁচালী'র বয়ানটা অত্যন্ত স্বদেশী। কিন্তু মূল কাজের অনেকটাই বাকী থেকে যায়। আজন্মকাল জন্মস্থানে থেকেও অনেকে অনেক জায়গায় ব্রাত্য থেকে যায়। বাঙালি পল্লীজীবনের new interpretation বলা যায় 'পথের পাঁচালী'কে এতে অবশ্য ঐতিহ্যের অলংকার মোটে ও লুপ্ত তা বলে সত্তার অলংকার ও ব্যবহার করা হয়নি। বইটা তার অস্তিত্বের ধ্বজা উড়িয়েছে নিজের glamour এ আবার এতেই আছে যথার্থ কাহিনি story telling এর স্বাদ। অনেক দেখা জিনিসকেও নতুন করে দেখতে শিখিয়েছে এই 'পথের পাঁচালি'। বিভূতিভূষণের শেষ উপন্যাস 'ইচ্ছামতী' (১৯৫০) বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য। এখানে মানুষের জীবনের গতি আর ইছামতীর গতি যেন মিলেমিশে এক হয়ে গেছে। 'এই সব ভিটে দেখে তুমি স্বপ্ন দেখবে অতীত দিনগুলির, স্বপ্ন দেখবে সেই সব মা ও ছেলের, ভাই ও বোনের, যাদের জীবনে ছিল একদিন এইসব বাস্তুভিটের সঙ্গে জড়িয়ে'—এই ভাবেই উপন্যাসের শুরু হয়েছে। অর্থাৎ মানুষ তাদের বাস্তুভিটে হারিয়েছে কিন্তু মন থেকে তার মায়া মুছে ফেলতে পারে নি। স্বপ্নে এখনও সেই ভিটে, সেই সম্পর্ক তাড়িয়ে বেড়ায়। 'ওদের সকলের সামনে দিয়ে ইছামতীর জলধারা চঞ্চলবেগে বয়ে চলেছে বড়ো লোনা গাঙের দিকে সেখান থেকে মোহনা পেরিয়ে, রায়মঙ্গল পেরিয়ে গঙ্গাসাগর পেরিয়ে মহাসুদ্রের দিকে। লেখক উপন্যাসের সমাপ্তি করেছেন এইভাবে। ইচ্ছামতী এখানে প্রতীক, তার অনর্গল বয়ে চলার সাথে মানুষের জীবনের বয়ে চলার তুলনা করেছেন। লেখক এছাড়াও অনেক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যেমন, নীল চাষ সংক্রান্ত বিশয়, অশিক্ষিত নালু পাল শুধু মাত্র অর্থের জোরে সমাজে গণ্যমান্য ব্যক্তি হয়ে উঠছে, বাংলার নানা উৎসব অনুষ্ঠানের চিত্র সব কিছু নিয়েই একটা গোটা উপন্যাস। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলেই মনে হয়। একজন মজুরের উক্তি, সুমুন্দির সায়েবগুলো এই ঠানটায় বসে কত মুরগির গোস্ত ধুনেছে আর ইঞ্জিরি বলেছে। সুমুন্দির, ঠানটায়, ইঞ্জিরি সেইসব শব্দ

জনমজুরের মুখে বসিয়ে আঞ্চলিক বিষয়কে প্রমাণিক করে তুলেছেন। মনে রাখার বিষয় যখন বিভূতিভূষণ এই সব ভাবনার, স্বপ্নের প্রসঙ্গ আনছেন তার বহু পূর্বেই 'কল্লোল' যুগ শুরু হয়ে গেছে। জীবনের কঙ্কালকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে উন্মুক্ত করার প্রথা চালু হয়ে গেছে। তার পরও বিভূতিভূষণ সেই ট্রাডিশনে আগ্রাহ্য করে একের পর এক রোমান্টিক বিষয় নিয়ে উপন্যাস লিখে গেছেন। তাঁর উপন্যাসে প্রকৃতি অন্য মাত্রা পেয়েছে। 'পথের পাঁচালী'তে যে পথের শুরু 'ইচ্ছামতী'তে যেন সেই পথের শেষ, মাঝখানে দিয়ে কালের গতিতে কত জীবন বয়ে গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরেই যাঁর নাম আসে তিনি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১)। 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১) দিয়ে তাঁর উপন্যাসের যাত্রা শুরু। তিনি অনেক উপন্যাসই লিখেছেন, তবে আলোচনার সুবিধার্থে তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) আমাদের আলোচ্য। মূলত রাঢ় বাংলার গ্রামকে তার উপন্যাসের পটভূমি হিসাবে পাই। গ্রামেরই এক বৃদ্ধা সুচাঁদ পিসি এখানে গল্পের কথক। এই উপন্যাসে বাঁশবাদীর কাহারদের জীবনচিত্র, ধর্মবিশ্বাস, ঐতিহ্য প্রীতির সঙ্গে উপকথার যেমন যোগ আছে, হাঁসুলি বাঁকের সীমানার সঙ্গেও তেমনই যোগ আছে উপকথার। কাহার সম্প্রদায়ের মানুষেরা এখানে যথাযথ ভাবে বিকশিত হয়েছে। তাদের জীবন জীবিকা, আচার ধর্ম, মানসিকতার অপূর্ব রূপরেখা। অন্ধ বিশ্বাস মানুষের জীবনকে কীভাবে প্রভাবিত করতে পারে তারও পরিচয় পাই। এখানকার মানুষগুলি যেন কোন অদৃশ্য শক্তি পরিচালিত। পুতুলনাচের পুতুলের মতো কোন এক অদৃশ্য সুতোর টানে তারা যেন নেচে চলেছে। মানুষ হয়েও তারা এখনও আদিম পশুর মতো জীবন যাপন করে চলেছে। লেখকের উক্তি নিয়ে বলি, ''বাঁশবাদীর বাঁশবনে অর্থাৎ প্রান্তীয় সমাজের প্রান্তশ্রেণিতে আজও অন্ধকার কাটেনি। সে অন্ধকার রাত্রে এগিয়ে এসে বাঁশবাদীর কাহার পাড়াকে আচ্ছন্ন করে। অন্ধকারের মধ্যেও কাহারদের দৃষ্টি সামনে। ওদের চোখ এখন ও অসম্ভব শক্তিশালী। ক্ষুধার জ্বালা এখনও আছে তাদের চোখে। যার দ্বারা ওরা অন্ধকারভেদে সক্ষম। অন্ধকারভেদী আরন্যক জন্মের দৃষ্টিশক্তি। পুরোনো ঐতিহ্যের রক্ষা এবং নতুন যন্ত্র সভ্যতায় প্রবেশ এই নিয়ে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছে। আদিকালের সমস্ত বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে থাকতে

চেয়েছে সুচাঁদ পিসি, অন্য দিকে সমাজপতি বনোয়ারী আধুনিক মনস্ক। ভাষার ক্ষেত্রে তারাশঙ্কর যথাযথ আঞ্চলিকতা বজায় রেখেছেন। যেমন সুচাঁদ পিসির মুখের ভাষা 'যে অক্তের ত্যাজে এমন বাড় হয়েছে, সে অক্ত জল হয়ে যাবেন তোমরা। গিহিনী ওগ হবে, ছেলে উগী হয়ে পড়ে থাকবে, ওই পাথরের মতো ছাতি ধসে যাবে, হাড় পাঁজর ঝুরঝুর করবে'। করালী কাহাদের সমস্ত রীতি নীতিকে ভেঙে ফেলতে চায়। বনোয়ারী তা রোধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু করালী শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। কাহারদের অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, অশিক্ষা, জীবনের ঘাত প্রতিঘাত, সংগ্রামের কাহিনি নিয়ে এক অদৃশ্য তাড়নায় উপন্যাস এগিয়ে চলেছে।

'মানিকই একমাত্র আধুনিক লেখক যে 'কল্লোল' ডিঙিয়ে বিচিত্রায় চলে এসেছে- পটুয়াটোলা পটল ডাঙায়। আসলে সে 'কল্লোলের'ই কুলবর্ধন'। বিজ্ঞানের ছাত্র হওয়ার জন্যই সম্ভবত তাঁর উপন্যাসে কঠিন কঠোর বাস্তব, বৈজ্ঞানিক যুক্তি, ক্ষুধা, জৈবিক ক্রিয়া কর্ম বারাবার ঘুরেফিরে এসেছে। 'জননী' (১৯৩৫) দিয়ে যাত্রারম্ভ, কিন্তু এটিকে ঠিক উপন্যাস বলা যায় না বরং বড় গল্প বলাই ভাল। উপন্যাস হিসাবে প্রথম সফল ১৯৩৬ সালে 'পুতুল নাচের ইতিকথা'। পুতুল জড় পদার্থ তাকে নাচায় জীব অর্থাৎ এখানে মানুষ পুতুলে পরিণত হয়েছে, তাকে নাচাচ্ছে অন্য এক অদৃশ্য শক্তি উপন্যাসে উল্লেখ সংসারে মানুষ চায় এক হয় আর এক চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বইতো নই আমরা। একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন। উপন্যাসের শেষেও এই রকমই অদৃষ্ট, অজানা শক্তির কথাই বলা হয়েছে, 'নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বইতে পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে। মধ্যকর্ষণের মতো যা চিরন্তন অপরিবর্তনীয়। রোমান্টিকতাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করেছেন উপন্যাসে কারণ, 'তাল বনে শশী কখনো যায় না। মাটির টিলাটির ওপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার সখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না। অর্থাৎ কঠিন কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি লেখক।

পত্রিকার হাত ধরে অনেক ঔপন্যাসিকের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তাঁরা রোম্যান্টিকতা বর্জন করেছেন। এখানে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তী একাধিক ঔপন্যাসিক

সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। প্রথমেই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০) উপন্যাস। তিনি মূলত ঐতিহাসিক উপন্যাস ও ডিটেকটিভ উপন্যাসই লিখেছেন। তাঁর সৃষ্টি ব্যোমকেশ চরিত্র পাঠক মহলে আজও সমাদর পায়। এর পর আসি শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৬) এর উপন্যাস। তাঁর 'কয়লাকুঠির দেশ' বাংলা উপন্যাসে পালাবদল ঘটিয়েছে। খনি অঞ্চলের বাস্তব সম্মত বিষয় নিয়ে লিখেছেন, কুলি মজুরদের জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় খুঁজে পাওয়া যায়। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কয়লা কুঠির কুলি মজুরদের জীবনচর্যা-ই এই উপন্যাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। কয়লা কুঠির কুলি, মজুর, সাঁওতালদের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনযাত্রার যে রঙ ফুটে উঠেছে তা এই উপন্যাসকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে।' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের (১৯০৩-১৯৭৬) উপন্যাসে নরনারীর যৌনতা, বস্তির জীবন, ইত্যাদি অন্ত্যজশ্রেণির জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। একটি উপন্যাস সম্পর্কে লেখকেরই মত, 'কল্লোল' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলে সর্বাঙ্গীনভাবে সমালোচক হবার সঙ্গে সঙ্গে মহলে বিরাট ঝড় ওঠে। রচনার বিষয়বস্তু, কথনরীতি সবই যেন ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে। সতীনাথ ভাদুড়ির 'জাগরী' একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। মুখ্য চারটি চরিত্র জেলের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে। তারা সবাই নিজের মনের কথা নিজমুখেই বলে চলেছে। একটি ফাঁসির আদেশের কেন্দ্র করে সকলের মনের অবস্থাকে ভাষা দিয়েছেন। সম্পূর্ণ আত্মকথনমূলক উপন্যাস এটি। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের উপন্যাস সম্ভবত এই প্রথম।

বাংলা উপন্যাসের সার্থক সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। তিনি তাঁর উপন্যাসে ইতিহাস ও কল্পনার মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। তাঁর উপন্যাসে বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) ও 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)তে ঐতিহাসিক বিষয়কে রোমান্সের মোড়কে পরিবেশন করেছেন, 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) এ সামাজিক বিষয়কে বর্ণনা দক্ষতায় আকর্ষনীয় করেছেন, আবার 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪) 'সীতারাম'(১৮৮৭)এ আদর্শবোধকে হাতিয়ার করেছেন। পরবর্তী রবীন্দ্রনাথ ও প্রথম দুটি উপন্যাসে অর্থাৎ 'বউঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) ও 'রাজর্ষি' (১৮৮৭)তে ইতিহাস ও রোমান্সের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। 'চোখের বালি'তে মনের কথা, 'চার অধ্যায়' এ আদর্শ, 'ঘরে বাইরে' স্বদেশ চেতনা,

নিয়ে উপন্যাসকে অন্য মাত্রা দিয়েছেন। বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস শিক্ষিত পাঠকের জন্য। তাদের নায়ক নায়িকারা উচ্চবংশজাত, সূক্ষ সংস্কৃতি সম্পন্ন ভাবগত তাই শরৎচন্দ্র হাজির হলেন বাংলার গ্রাম, সমাজ, পরিবেশ, জমিদার, চাষী ইত্যাদি সহজ সাধারণত বিষয় সহজবোধ্য। তবে তাঁর উপন্যাসে গল্পের প্রাধান্যই বেশি যা বাঙালিকে চোখের জলে ভাষায় সাধারণভাবে আমরা যা দেখি উপন্যাসে আমরা তা দেখতে চাই না। আমরা যা দেখতে পাই না অথচ দেখার ইচ্ছা রাখি তাই উপন্যাসে খুজি তাই ব্যক্তি নয় ব্যক্তিমনকে উপন্যাসে দেখতে চাই। এর জন্য প্রয়োজন ব্যক্তিমনের বিশ্লেষণ যা পূর্বে উল্লিখিত ঔপন্যাসিকরা দক্ষতার সাথে করেছেন। রবীন্দ্র পরবর্তী ঔপন্যাসিক হিসাবে বন্দ্যোপাধ্যায় এয়ী, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি উপন্যাস গতিশীল শিল্প মাধ্যম। তাই কোনো নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে একে গণ্ডীবদ্ধ করা যায় না। তাই লেখকের মূল লক্ষ হল বানানো আখ্যানকে পাঠকের সামনে বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করা। এর জন্য তাঁকে কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নীতির উপর নির্ভর করতে হয় না। ঔপন্যাসিক এব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী। তবে বিষয় ও চরিত্রের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করাও লেখকের দায়িত্ব। সমগ্র মানব জীবনের কতটুকু কীভাবে উপন্যাসে স্থান দেবেন তা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ব্যাপার, কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম আজ পর্যন্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহিত হয়নি।

বাংলা উপন্যাসের সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে হলেও তিনিই একমাত্র নন, মূলত ঔপন্যাসিকের কাজ একটা গল্প বলা। তবে সেই গল্প রূপকথার গল্প নয়। বাস্তবের মানুষ, তার জীবন, পরিবেশ, সমাজ-সংসার, সুখ-দুঃখ ইত্যাদি একাধিক পার্থিব বিষয় উপন্যাসের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। আমরা উপন্যাস বলতে 'কল্পকাহিনি'কে বুঝিয়ে থাকি। লেখক যখন লেখেন কোনও কাহিনি বিস্তারিত রূপে এক থেকে একাধিক উপকাহিনির সমন্বয়ে একটি আদি মধ্য অন্ত যুক্ত বিষয়কে নিয়ে পরিণতির দিকে যান বঙ্কিম রচনায় বিভিন্ন ধরনের উপন্যাস পাই। তার মধ্যে ঐতিহাসিক, সামাজিক, দেশাত্মবোধক ইত্যাদি একাধিক বিষয়। তিনি ঐতিহাসিক নন, সাহিত্যিক, তাই তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের মধ্যে ইতিহাসের খুঁটিনাটি খুঁজতে গেলে

ব্যর্থ হব। ঐতিহাসিক বিষয়কে কল্পনার মিশ্রণে মানুরে জীবনবোধের ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। এখানে সমাজের অসামাজিক চিত্র তুলে ধরে তিনি প্রধানত নীতিশিক্ষা দিতে চেয়েছেন। উপন্যাসের শেষে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন, বিষবৃক্ষের কুপ্রভাব কতখানি সমাজ কাঠামোকে নাড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি আশা করেছেন বাঙালির ঘরে ঘরে অমৃতফল ফলিবে। বঙ্কিম উপন্যাসে আমরা একটি নিটোল কাহিনি পাই।

সামাজিক ও পারিবারিক বিষয় নিয়ে বঙ্কিম সমসাময়িক রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ও দু'খানি উপন্যাস লিখেছেন 'সংসার' (১৮৮৬) এবং 'সমাজ' (১৮৯৪) সমালোচকেরা এগুলিকে উপন্যাস হিসাবে স্বীকার না করলেও উপন্যাস লক্ষনাক্রান্ত বলতেই পারি। সেই সময়ে বিবাহ সম্পর্কিত যে সমস্যা তার মধ্যে প্রধান হল বিধবাবিবাহ এবং অসবর্ণবিবাহ। এই দুটি বিষয়েই তিনি বিস্তারিত ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। লেখককে বাদ দিয়ে বয়ান হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র এই সময়ে দাঁড়িয়ে লিখেছেন বিধবা বিবাহের বিপক্ষে। তাঁর কুফল তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন। আবার রমেশচন্দ্র তাঁর বিপরীতে হাঁটছেন। অর্থাৎ একই সময়ে, একই সমাজে অবস্থান করেও ব্যক্তি বিশেষে বয়ান পাল্টে যাচ্ছে।

উপন্যাসের আলোচনায় তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আগেও উল্লেখ করেছি। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বিভূতিভূষর বন্দ্যোপাধায়। তাঁর 'পথের পাঁচালী' নামে পাঁচালী হলেও বাস্তবে তার সঙ্গে কোনও মিল নেই। একটি সাদামাটা গ্রাম নিশ্চিন্দিপুর। সেখানকার একটি পরিবার, সেই পরিবারের কয়েকটি মানুষের গল্প। তাদের অভাব, অঘটন, অভাবের তাড়নায় পরিবার ত্যাগ, পরিবারের টানে আবার গ্রামে ফিরে আসা। শুধু এই ঘটনাগুলি হলে এত মর্যাদা বোধহয় সাহিত্য হিসাবে পেত না। একটি ছোট্ট ছেলের চোখে লেখক দেখলেন প্রকৃতিকে। চারদিকে সমস্ত কিছু না-এর মধ্যেও স্বপ্ন দেখে যায়। লেখক আমাদেরও স্বপ্ন দেখতে শেখালেন। এর দশ বছর পর তিনি পৌঁছে গেলেন ঘন অরণ্যে, বয়ানের নাম দিলেন 'আরণ্যক' (১৯৩৯) খ্রিঃ প্রথম প্রকাশিত হল। সময়ের দিকে তাকালে আমরা অবাক হই। এবং লেখকের মানসিকতার কিছুটা আভাস পাই। সবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে, চারিদিকে হিংসা, বারুদের গন্ধ, তার মধ্যে লেখক আমাদের নিয়ে গেলেন প্রকৃতির গাঢ় অন্তরে। এখানেও চরিত্রের ভিড় নেই। কাহিনির ফেনিল আভাস

নেই। তবে একটা জিনিস আমরা জানতে পারি, আমরা অনেকটা তথাকথিত আধুনিক হয়ে গেছি। জঙ্গল কেটে বসত বাড়ি বানাতে শিখে গেছি। লেখক কেন যুদ্ধ থেকে মুখ ফিরিয়ে আমাদেরকে প্রকৃতির কোলে নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন। অনেকে 'অরণ্যক'-কে উপন্যাসের স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু লেখক স্বয়ং ভূমিকায় স্বীকার করেছেন,

''অরণ্যক ডাইরি বা ভ্রমণ কাহিনি নয়— উপন্যাস''[৩]

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে লেখক শান্ত, সিগ্ধ, গ্রামের ছবি এঁকে মানসিক সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারেননি। এরপরেও তিনি অপুর জীবন নিয়ে আরও এগিয়েছেন। অতএব 'পথের পাঁচালী' শেষ নয়। শেষের পরেও আরও কিছু লেখক বলতে চাইছেন। এরপর তিনি চলে যাচ্ছেন অরণ্যবাসী মানুষ, তাদের জীবনযাপনের কথা, অরণ্য ধ্বংস করে নগর পরিকল্পনার কথাও আমরা জানতে পারছি। জনসংখ্যার বিপুল বিস্ফোরণ, যান্ত্রিক সভ্যতার দিকে অগ্রগতি এ সবই আরণ্যকের আখ্যান ভাবনায় আমরা দেখতে পাই। ভারতবাসী হয়েও দেশের নাম তারা জানে না, এই অক্ষমতা আমাদের, তাদের জীবন থেকে অরণ্যক কেড়ে নেওয়ার ঔপনিবেশিক মানসিকতা আমাদের মনে তখন জেঁকে বসেছে।

উপন্যাসের মধ্যেকার একটি বিষয় হল আখ্যান। আখ্যান কাহিনি নয়, গল্প নয়, আখ্যান মূলত একটা ভাবনা। সেই ভাবনাকে তুলে ধরতে লেখক বয়ানের সাহায্য নেন। সেটা উপন্যাস বা গল্প যে কোনও প্রকরণই হতে পারে। আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু উপন্যাস। তাই আমরা উপন্যাসের আখ্যান নিয়েই আলোচনা করছি। আখ্যানকে উপন্যাসের বীজ হিসেবে ধরে নিতে পারি। কাহিনির মূল বিষয়। লেখক তার ভাবনাকে তার লেখনীর মাধ্যমে আমাদের সামনে তুলে ধরতে চান। সেই ভাবনাকে পরিষ্কার করে বলার জন্য কিছু মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে থাকেন। তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হল উপন্যাস। উপন্যাসে কোনও একটি বা একাধিক ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ থাকবে, একাধিক চরিত্র থাকবে চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকবে। কাহিনির উত্থান-পতন থাকবে। এই সব বিষয় আমাদের জানা। কিন্তু বর্তমান সময়ের চাহিদা মেনে আমরা অর্থাৎ পাঠককুল এই সব পুরোনো বিষয়ে আর আস্থা রাখতে না পেরে নতুন কিছু পেতে চাই। উপন্যাসে শুধু গল্প আর পাঠককে মানসিক স্বস্তি দিতে অপারগ এই নতুনের

চাহিদা থেকেই উপন্যাসে আখ্যান ভাবনার সূত্রপাত।

পাঠকৃতি আগে না তত্ত্ব আগে, এই প্রশ্ন তত্ত্ব আলোচনার প্রথম লগ্ন থেকেই। পাঠকৃতি বা বয়ান বলতে আমরা এখানে উপন্যাসকেই বোঝাতে চাসছি। উপন্যাস রচনার আগে তত্ত্ব না তত্ত্ব আলোচনার পরে উপন্যাস। কোনটাই সেই অর্থে সত্য নয়। লেখক উপন্যাস লেখেন তাঁর ভাবনা থেকে। সমালোচকেরা একাধিক উপন্যাসের আলোচনায় একটি সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে এবং তত্ত্বের সৃষ্টি হয়। তত্ত্ব জেনে কোনও লেখক উপন্যাস লিখতে বসেন না। যদিওবা কোনও লেখকের তত্ত্বজ্ঞান থেকে থাকে তবুও তাঁর রচনায় তত্ত্বের কোনও প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে বলে মনে হয় না। আমাদের আলোচ্য আখ্যানতত্ত্ব আখ্যানের সংগঠন নিয়ে আলোচনা করে মাত্র নতুন আখ্যান সৃষ্টি করতে খুব একটা সহায়ক বলে মনে হয় না। তত্ত্ব মূলত পাঠক আশ্রয়ী। পাঠকদের পড়তে শেখানোর মাধ্যম হতে পারে তত্ত্ব। পাঠকৃতি বা বয়ান বুঝতে তত্ত্বের প্রয়োজন হয়।

বিশ শতকে আখ্যানতত্ত্বের উদ্ভব। তা হলে তার পূর্বে আখ্যান রচনা কি বন্ধ ছিল। তা মোটেই নয়। সময়ের চাহিদা মেনে নতুন পাঠকদের চাহিদামতো বয়ানের আধুনিকতা কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করেই সৃষ্টি হতে থাকে। পূর্বে আমরা অর্থাৎ পাঠক মূল উপন্যাসে বা গল্পে কল্পিত কাহিনি শুনতেই ভালোবাসতাম। তারজন্য আমরা মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলাম। লেখক সেখানে সবসময় আড়ালে থেকে সর্বজ্ঞের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে আমাদের জ্ঞান বা নীতিকথা বিতরণ করতেন। কিন্তু বর্তমান সময় সেই পাঠক আর নেই। তারা সবকিছুই জানতে চান,বুঝতে চান। বয়ান থেকে লেখককে জানতে চান। বর্তমান লেখকরাও আর শুধু গল্প লিখে ক্ষান্ত থাকতে পারছেন না। তাদের ভাবনাকে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করার জন্য উঠেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ী এই সর্বজ্ঞের ভূমিকায় মাঝে মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন। তবে সাম্প্রতিক কোনও কমলাকুমার মজুমদার, অমর মিত্র, দেবেশ রায় প্রমুখ ব্যক্তিরা উপন্যাসের এক নতুন ধরণের অবতারণা করেছেন। শুধু গল্প পড়ার আশায় এঁদের লেখা পাঠ করতে বসলে পাঠক ব্যর্থ হয়ে ফিরবেন। আধুনিক সময়, ঘটনা, লেখক এই সব কিছুতেই জানতে এবং বুঝতে পাঠকও উদগ্রীব লেখকরাও তার জন্য প্রস্তুত।

বিশ শতকে আখ্যানতত্ত্বের হাত ধরে একাধিক আখ্যান প্রস্থানের জন্ম হয়েছে। সমাজ

আখান, নারী আখ্যান, রাজনৈতিক আখ্যান। দেশ ভাগের আখ্যান ইত্যাদি একাধিক প্রস্থানের একটি বয়ান কখনও একটি মাত্র প্রস্থানের ধারক হতে পারে আবার একাধিক প্রস্থানের মিলনও হতে পারে। পূর্বে উপন্যাসের নায়করা হতেন শিক্ষিত, মার্জিত রুচির। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আমরা এই ধরনের বিন্যাসই দেখতে পাই। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে আমরা অস্বীকার করতে পারি না। কারণ তখন উপন্যাসের পাঠক তৈরি হয়নি। সেই সময়টা ছিল পাঠক তৈরির সময়। ক্রমে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে বয়ানের ভাবনা বদলেছে। পাঠকেরও ভাবনা বদলেছে। ভালো গল্পের থেকেও তাদের জিজ্ঞাসু মন আরও কিছু জানতে চায়। লেখকগণও পাঠকের চাহিদামতো তাদের বয়ানরীতি, বিষয় পাল্টেছে। অঞ্চলভিত্তিক উপন্যাস রচিত হয়েছে। সমাজের নিম্নবর্গ এবং নিম্নবৃত্তিয় মানুষেরা উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র হয়ে উঠেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসই তার দৃষ্টান্ত।

কথা সাহিত্য কথার সাহিত্য। সেখানে ভাষা একটি অপরিহার্য অঙ্গ। ভাষার সূত্র ধরেই কথা এবং কথার পরবর্তী স্তরে লেখা। লেখার ক্ষেত্রেও ভাষা ছাড়া ভাবতেই পারি না। কথা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবীনতম সংযোজন উপন্যাস। উপন্যাসে মানুষের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। কখনও ব্যক্তি মানুষ কখনও সমষ্টি মানুষ। তাদের কথা বলতে গিয়ে লেখক ভাষা নির্মাণ করে নিয়েছেন। বাস্তব সমাজে যেমন আমরা সবাই একই ভাষায় কথা বলি না, উপন্যাসেও সমস্ত ভূমিকা একই ভাষায় তাদের সংলাপ বলে না। সমাজের নানা স্তরের মানুষ নানা রকম ভাষায় তাদের আলাপ চালিয়ে যান। উপন্যাস সমাজের প্রতিচ্ছবি তাই সমাজের খুঁটিনাটি বিষয়ও উপন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয়।

বাংলা উপন্যাসের সূচনা বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরে। তিনি মূলত উপন্যাসই লিখেছেন। সেখানে গল্পের ঘনঘটা, চরিত্রের আধিক্য, তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। লেখক সেখানে নিরপেক্ষ থাকতে পারেননি। উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি নীতি শিক্ষারও আসর জমিয়েছেন। নীতি বিচ্যুত মানুষজনের পরিণতিও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন। পাঠক কুলকে সেভাবে ভাবার অবকাশ তিনি দেন নি। উপন্যাসের Form এর পরিবর্তন তিনি করেছেন কিন্তু Author এর Authority তিনি পরিত্যাগ করতে পারেন নি। সময়ের সরনী বেয়ে তার পরই আসে রবীন্দ্র উপন্যাস সেখানেও একই সুর।

তবে তার 'চতুরঙ্গ' উপন্যাস ব্যতিক্রমী হয়ে উঠেছে। সেখানে কথক তার দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ Focalitation ব্যবহার করেছেন। চারটি অধ্যায়ে চারটি আলাদা আলাদা গল্পের মধ্যে দিয়ে একটি বিষয়কেই বয়ে নিয়ে বেরিয়েছেন। আবার শরৎ উপন্যাসে এসে এক মায়ায় আমরা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। গ্রামজীবনের সমস্যা, গ্রামের মানুষের সমস্যা তার বয়ানে ভাষা পেয়েছে। তিনি বড় গল্পের উপহার দিয়েছেন। টাইপ চরিত্র তিনি সৃষ্টি করেছেন, সেখানেও তিনি উপন্যাসকার, আখ্যানকার হয়ে উঠতে পারেননি।

বাংলাদেশে ততদিনে পাঠক সমাজ মোটামুটিভাবে তৈরি হয়ে গেছে। তাই পাঠক আর এইসব বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে থাকল। সমাজ সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে পাঠক সমাজেরও পরিবর্তন সূচিত হল। লেখকের কর্তৃত্ব তারা আর সহ্য করতে পারল না। তারাও বয়ানের অংশীদার হতে চাইল। সমস্ত পাঠ্য সাহিত্যই পাঠক নির্ভর। পাঠক সমাজের মুখ ফেরানোর ফলে লেখক সমাজের চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল। তাদের চাহিদা মতো বয়ান আর শুধু গল্পে আটকে থাকল না। কাহিনি ক্রমশ ফিকে হয়ে গিয়ে Content বা বিষয় নির্ভর হয়ে উঠল থাকল। অর্থাৎ একটা থিমের ব্যবহার লক্ষ্য করা গেল। সেখানে কাহিনি, চরিত্র সবই থাকল কিন্তু তারা কেউই প্রধান না, একটা অন্য ভাবনা বয়ানের মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করল। চরিত্ররা সেখানে শুধুমাত্র ভূমিকা গ্রহণ করে মাত্র। পাঠক মনে চরিত্রের কোন স্থায়ী প্রভাব পড়ে না। বিষয়টা বা ঘটনাটাই তাদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রেও আমরা অ্যারিস্টটলীয় ভাবনার প্রকাশ লক্ষ্য করি।

সমকালে বয়ানের ভাষা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাষার আলোচনার সূত্রেই আখ্যানতত্ত্বের আলোচনার সূত্রপাত। ভাষার কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনার বিষয় যেমন ভাষাতত্ত্ব ঠিক একই ভাবে আখ্যানের কাঠামো সংক্রান্ত আলোচনার বিষয় আখ্যানতত্ত্ব। ভাষা প্রথমে কথ্য তার পর লেখ্য। বাংলা ভাষারও দুটি রূপ লক্ষ্য করি একটি লেখ্য ভাষা বা সাধুভাষা এবং কথ্য ভাষা বা চলিত ভাষা। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম দিকে বর্ণনার ভাষা ছিল সাধু। সেখানে ব্যক্তি তেমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার করেনি। অতএব তখন আমাদের মনে খটকাও লাগেনি। বর্তমান সময়ে পাঠক এই বিশ্বাসে আস্থা রাখতে পারেনি। তারা মুখের ভাষাই বয়ানের ভাষা হিসাবে

মান্যতা দিয়েছে। মানুষের অস্তিত্ব এবং ভাষা দুটিই অঙ্গাঙ্গি সম্পর্কযুক্ত। যতদিন মানুষ থাকবে ততদিন তার ভাষাও সজীব থাকবে, উপন্যাসের মূল বিষয়ও মানুষ, তার সঙ্গে সম্পর্কিত ভাষাও মূল উপাদানের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। আর মানব সমাজ এই ব্যক্তি মানুষের যোগফল।

> ‘‘সমাজ যেমন জটিল একটি System ভাষাও তেমনি জটিল System। ভাষা বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি ধ্বনিমূল এবং ধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত শব্দ, শব্দের সমন্বয়ে গঠিত বাক্য এবং বাক্যে মধ্যে অর্থ প্রবাহ। শুধু ব্যক্তি নিয়ে যেমন সমাজ হয় না। তেমনি শুধু ধ্বনিমূল নিয়েও ভাষা হয় না। ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির সম্পর্ক, শব্দের সঙ্গে শব্দের সম্পর্ক এবং বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সম্পর্ক বোঝায়।’’[৪]

ভাষা ঐতিহ্যকেও বহন করে চলে। বয়ানে সমকাল যেমন ভাবে প্রকাশ পায়। ভাষাও তার সমকালকে বহন করে চলে। সাহিত্য নির্মাণ, ভাষা ছাড়া হতে পারে না। যে কোন নির্মাণেই নির্মাণকর্তা আগে একটি ভাষাছন্দ নির্মাণ কনে নেয়। সমকালের প্রয়োজনী বিষয় যেমন পাল্টে যায় একইভাবে ভাষাও তার সমাজ ও সময়কে অনুসরণ করে পাল্টে যায়। আমাদের আলোচ্য উপন্যাস বয়ান তার একাধিক দৃষ্টান্ত আমরা পূর্বেই লক্ষ করেছি। যেকোন কালেই লেখক তাঁর বয়ানে একটা সময়কে ধরতে চান আর সেই অনুগামী ভাষা ও নির্বাচন করতে হয়।

উপন্যাসে সময় একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সময়ের ওপরই নির্ভর করে বিষয় এবং ভাষা। দুটিই লেখকের মানসিকতার ওপর নির্ভর করে। কোন বিষয়কে তিনি মধ্যমনি করবেন তা সম্পূর্ণ তার নিজস্ব ব্যাপার। কতটা তিনি জানবেন কতটা লুকিয়ে রাখবেন। একটি বয়ানের বা Text এর কতকগুলি চাহিদা আছে।প্রথমত লেখকের চাহিদা। তিনি তাঁর নিজের জীবন অভিজ্ঞতা, সমাজ পরিবেশ লব্ধ জ্ঞান নিয়ে তাঁর নিজস্ব চাহিদার নিবৃত্তি ঘটাতে চান। সমকালের একটা নিজস্ব চাহিদা আছে। আর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঠকের চাহিদা। কারণ লেখ্য সাহিত্য যদি পাঠক পাঠই না করে তাহলে তার সমস্ত সার্থকর্তা ভুলুণ্ঠিত হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে দাঁড়িয়ে তার বহু পূর্বে মোগল যুগের কাহিনি অলম্বনে উপন্যাস রচনা করেছেন। ইতিহাসের

পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। তিনি ঐতিহাসিক না, সাহিত্যিক। তাই ইতিহাসের কাহিনি তিনি বলবেন না, বলেনও নি। ঐত্যিহাসিক চরিত্রের না বলা কথকে তিনি ভাষা দিয়েছেন, প্রকাশ করেছেন সর্বসমক্ষে। তার সঙ্গে লেখকের মনের কথাকে ও চরিত্রের আড়ালে বলে নিয়েছেন। তখন পাঠক নিরুপায়। বাংলা ঔপন্যাস বলতে তখন তিনিই। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাঠক বাধ্য হয়েছেন পাঠ করতে। কিন্তু বর্তমান সময়ে পাঠকের সামনে বেছে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তাই লেখকের চাপিয়ে দেওয়াকে তারা গ্রহণ নাও করতে পারেন। তাই লেখকেরাও নতুনের দিকে অগ্রসর হয়েছেন এবং বিশ শতকে এসে তার পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে উপন্যাস থেকে আখ্যান নন আলাদা একটি বয়ান পদ্ধতির সূচনা ঘটিয়েছেন। এটি উপন্যাসের একটি অঙ্গ হিসেবেই আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঙ্ম 'রবীন্দ্ররচনাবলী' (২য়) ১২৫ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত বিশ্বভারতী প্রকাশনা ১৩৯৩ অগ্রহায়ণ পুর্নমুদ্রণ ১৪১৫, পৃঃ-৩৭০।

২। সুকুমার সেন ঙ্ম 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (৩য়) ষষ্ঠ মুদ্রণ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃঃ-২৩৭।

৩। হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ঙ্ম 'গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৪১২, পৃঃ-১৪৭।

৪। বেলা দাস ও বিশ্বতোষ চৌধুরী ঙ্ম 'বাংলা আখ্যান বহুমাত্রিক পাট' রত্নাবলী, কলকাতা, ২০১১ পৃঃ-৪৮।